ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ২১৭-২৪০
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4115

সাহিত্যিক উপাদানে তেতাল্লিশের মন্বন্তর

মোছাঃ রাহেনা বেগম
প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মো. ছাবেদ আলী
অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ (অব.), অতিথি শিক্ষক, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: The Famine of 1943 is one of the tragic events in twentieth century history of Bengal. During the World War II in 1943 approximately 2.5 million people died in that tragic incident. The Famine broke out in Bengal as a human curse. Countless Bengali poets and writers have been moved to create their works focusing on the disastrous event. Historical analysis abounds on why the Famine occurred and what were its consequences. However, the present study is an attempt to reconstruct the history of the Famine from literary sources such as drama, poetry, novels, short stories and contemporary writings.

Key Words: Famine, Literary material, Social condition.

ভূমিকা: বিশ শতকের চল্লিশের দশকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ যা ইতিহাসে তেতাল্লিশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এ মন্বন্তরে বিনষ্ট হয় হাজার হাজার গ্রাম। ভেঙ্গে পড়ে অর্থনৈতিক কাঠামো। অনাহারে, অর্ধাহারে মারা যায় বাংলার প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ।[১] অন্নকষ্ট সহ্য করতে না পেরে হতভাগা কৃষকরা ভিটেমাটি ও হালের বলদ বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে ভয়াবহতার চিত্র তাঁর *আনন্দমঠ* (১৮৮২) উপন্যাসে চিত্রায়িত করেছেন মূলত তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ ছিল তার চেয়েও মর্মান্তিক। ১৯৪৩ সাল কেবল ইতিহাসের একটা সালই নয়, নিজেই একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে পথে পথে চলে কঙ্কালের শোভাযাত্রা। কিন্তু এই শোভাযাত্রা থেকে কঙ্কালসার হতভাগারা চিৎকার করে বলে 'চারডি খেতে দাও মা!' 'চারডি এঁটো কাঁটা!' 'দুটো ভেন-ভাত!' বুভুক্ষুদের এমন আহাজারিতে বাংলার আকাশ-বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাদের আহাজারি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মৃত্যুই হয় তাদের শেষ ঠিকানা। বিজন ভট্টাচার্যের *নবান্ন* (১৯৪৪) নাটক, নুরুল মোমেনের *নেমেসিস* (১৯৪৮) নাটক, মঈনুদ্দিনের *আর্তনাদ* (১৯৫৮) কাব্য, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা ও ছোটগল্প, ফররুখ আহমদের কবিতা, বন্দে আলী মিয়ার কবিতা ও ছোটগল্প, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মন্বন্তর* (১৯৪৪) উপন্যাস এবং সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

আলোচ্য প্রবন্ধে এ সকল সাহিত্যিক উপাদানের আলোকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

নাটক

(ক) বিজন ভট্টাচার্যের নাটক *নবান্ন*

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ খাদ্যের অন্বেষণে সর্বভুক প্রাণীর মত ডাস্টবিন থেকে ডাস্টবিনে হানা দিয়ে ফিরেছে। ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে ডাস্টবিনে ফেলে রাখা উচ্ছিষ্ট নিয়ে মানুষ এবং কুকুরের মধ্যে কাড়াকাড়ি হতেও দেখা গেছে। এমনি এক দৃশ্যকে বিজন ভট্টাচার্য তুলে ধরেছেন তাঁর *নবান্ন* নাটকে। ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষের সময় শহরের রাজপথের পাশেই এক ধনীর আবাস ভবনে প্রায় হাজার খানেক লোকের আপ্যায়নের জন্য একটা মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। মঞ্চের ডান পাশে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাড়ির বড়কর্তা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে তার পরিষদবর্গসহ প্রধান ফটকে অবস্থান করছেন। ১০/১২ বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে ফুল দিয়ে অতিথিদের বরণ করছে। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারের একটি ডাস্টবিন রাখা আছে। কুঞ্জ এবং রাধিকা স্বামী-স্ত্রী। মন্বন্তরের সময় তারা বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাবার সংগ্রহ করে। দু'মুঠো ভাতের আশায় অনেক বুভুক্ষুদের সাথে কুঞ্জ এবং রাধিকাও বের হয়েছে। সন্ধ্যার পর অনেকেই বাড়ির প্রধান ফটকের সামনে এসে 'দুটো ভাত খেতে দাও বাবু' বলে হাকডাক ছাড়ে। কিন্তু কোন সাড়া না পেয়ে অবশেষে কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ থেকে আহার্য সন্ধান করার চেষ্টা করছে। উচ্ছিষ্ট খাবারের অংশ নিয়ে কুঞ্জ এবং কুকুরের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়। কুকুর রাগান্বিত হয়ে কামড়ে কুঞ্জকে ক্ষতবিক্ষত করে। কুঞ্জের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়তে থাকে। ভয়ে রাধিকা তার পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে এক ফালি ন্যাকড়া বের করে কুঞ্জের ক্ষতস্থান বেঁধে দেয়। রাধিকা রাগান্বিত কণ্ঠে আক্রমণকারী কুকুরকে পাজি, হারামজাদা ও লক্ষ্মীছাড়া কুকুর বলে গালি দেয় এবং কুকুরকে ঝাঁটা মারার সংকল্প করে।[২] বিজন ভট্টাচার্যের এ কাহিনীর মধ্য দিয়ে মন্বন্তরে আক্রান্ত নিরন্ন মানুষের বেঁচে থাকার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

(খ) নুরুল মোমেনের নাটক *নেমেসিস*

তেতাল্লিশের মন্বন্তরের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন নুরুল মোমেন তার *নেমেসিস* নাটকে। নেমেসিস নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুরজিত নন্দী। কলিকাতার নিকটে গঙ্গাতীরে তার বাগানবাড়িতে সুরজিত নন্দী জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বলছেন–

> লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বাংলাদেশ আজ নিরন্ন!... অনাহার ও ক্ষুধা দেশটাকে পিষ্ট করেছে। স্তনে দুধ নাই! চুষে চুষে দুধ না পেয়ে সন্তানগুলো কুকুরছানার মত কেঁই কেঁই করছে

> মার বুঁকে। সরীসৃপের মত, কেন্নার মতো, শহরের রাস্তাঘাটে কিল বিল করছে নরনারী, খাদ্যের অন্বেষণে। অসূর্যম্পশ্যা যুবতী দেহ বিকিয়ে দিচ্ছে অবহেলায়, এক মুঠো অন্নের জন্য।[৩]

১৯৪৩ সালে ঔপনিবেশিক শাসনের পাশাপাশি দেশীয় চোরাকারবারী, কালোবাজারী ও মজুতদাররা অবৈধভাবে খাদ্য মজুদ করে দেশকে মহাদুর্ভিক্ষের মধ্যে ঠেলে দেয়। ফলে অনাহারে মারা যায় অগণিত মানুষ। গ্রীক প্রতিহিংসা দেবীর নাম নেমেসিস। ইংরেজি অভিধানে অন্যায়ের প্রতিশোধকেও নেমেসিস বলা হয়েছে। তাই নেমেসিস নাটকের সর্বপ্রধান নিয়ন্ত্রক চরিত্র স্কুল শিক্ষক এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী সুরজিত নন্দী দুর্ভিক্ষ সৃষ্টিকারী পাপাত্মাদের শাস্তি দাবি করেছেন এভাবে–

> বাংলা আজ নরকের ধূমায়িত অগ্নির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। যারা বাংলাকে এ দশায় পরিণত করেছে, যারা মানুষ হয়ে মানুষকে বঞ্চিত করেছে, তারা কি রেহাই পাবে? এই যে অত্যাচার-অবিচার এর কি প্রতিকার হবে না? Nemesis, প্রতিহিংসার দেবী, একবার ফিরে চাইবে না? হ্যাঁ চাইবে। যারা হকদারকে অন্ন দেয়নি, ভগবানের অবাধ দানকে যারা বেঁধে ফেঁপে উঠেছে, তারা কি ধরাশয়ী হবে? এক পুরুষে না হোক দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, সপ্তম পুরুষ এক ভগবানের প্রতিহিংসা সক্রিয় হয়ে ওদের কণ্ঠ চেঁপে ধরবে। তারা রেহাই পাবে না।[৪]

তেতাল্লিশের মন্বন্তর ছিল মানবতার এক মহা অভিশাপ। এই দুর্ভিক্ষের প্রথম প্রহরেই স্নেহলতার বাবা না খেয়ে মারা যায়। ইজ্জত বাঁচাতে গিয়ে স্নেহলতার মাকে চাকরি হারাতে হয়। শেষ পর্যন্ত দু'মুঠো অন্নের জন্য নিষ্পাপ স্নেহলতাকে দেহ বিক্রি করতে হয়েছিল। স্নেহলতা সে কথা অকপটে স্বীকারও করেছেন। তার ভাষ্য–

> আমি হলাম দাসীর মেয়ে; সুতরাং লালসার লিকলিকে জিহ্বা অবলেহন দুর্বার হয়ে উঠল চারদিক থেকে। রোধ করতে গিয়ে মার চাকরি গেল কয়েক জায়গায়। শেষ পর্যন্ত বিষে বিষক্ষয় করতে হলো। জ্যান্ত ক্ষুধা পেটেরটা মেটাতে গিয়ে দেহেরটাও মেটাতে হলো। গালভরা যে নোশনটা প্রাণপণে রক্ষা করতে চেয়েছিলাম প্রাণ রক্ষার জন্য সেটাকেই পণ দিলাম।[৫]

জঠরের ক্ষুধা নিবারণ করতে গিয়ে এ রকম হাজারো স্নেহলতাকে সতীত্ব বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

ছোটগল্প

(ক) সুকান্ত ভট্টাচার্য

তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন বিশ শতকের চল্লিশের দশকের একজন শক্তিমান লেখক। তিনি ছিলেন বাম রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। তাই তার লেখনীর মধ্যে শুধু দুর্ভিক্ষের

বর্ণনাই পাওয়া যায় না, বরং দুর্ভিক্ষকে জয় করে কীভাবে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে মুক্তি মিলবে সে পথের ইঙ্গিতও তিনি দিয়েছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন তেতাল্লিশের মন্বন্তরের একজন প্রত্যক্ষদর্শী। ১৯৪৩ সালের এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তিনি 'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য', 'দরদী কিশোর' ও 'কিশোরের স্বপ্ন' এ চারটি ছোটগল্প রচনা করেছেন। প্রত্যেকটি গল্পেই দুর্ভিক্ষের বারুদের দগ্ধ জীবনের কাহিনী ফুঠে উঠেছে। সুকান্ত ভট্টাচার্য তার 'ক্ষুধা' গল্পে ক্ষুধার আদিম, অকৃত্রিম ও ভয়ঙ্কর রূপ এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে ক্ষুধার কাছে পারিবারিক বন্ধন, স্নেহ-মমতা ও প্রেম-ভালবাসা পরাজিত হতে বাধ্য। এই গল্পে তিনি চিত্রায়িত করেছেন হারু ঘোষ ও নিলু ঘোষ সহদর ভাই। বড় ভাই হারু ঘোষ চাকরি করে চটকলে। মাসিক বেতন ২৫ টাকা। আর ছোট ভাই নিলু ঘোষ একটা প্রেসে কাজ করে। মাসিক বেতন ১৫ টাকা। নিলুর কাছে হারু অবস্থাপন্ন। তাই নিলু তাকে ঈর্ষার চোখে দেখে এবং বড়লোক বলে সম্বোধন করে। দুই ভাইয়ের মধ্যে এমনিতেই সম্পর্ক খারাপ ছিল। তদুপরি তেতাল্লিশের মন্বন্তরে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। হারু ঘোষের কোন সন্তান ছিল না। তাই স্বামী স্ত্রীর খেয়ে পড়ে কোনভাবে দিন কাটে। কিন্তু নিলুর সংসারে অভাব লেগেই থাকে। একদিকে আয় কম তদুপরি ঘরে আছে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী যশোধা। শিশু বাচ্চা তিনু যে সর্বদা খাবারের জন্য মাকে বিরক্ত করে। তাই অনেক সময় নিলু ঘোষের স্ত্রীকে হারু ঘোষের কাছ থেকে চাল-ডাল ধার নিতে হতো। একদা নিলু ঘোষ শত চেষ্টা করেও কোন খাবার সংগ্রহ করতে পারল না। হারু ঘোষ ভাবলো তার বাসায় সামান্য যা চাল আছে তা দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর অন্তত একবেলা চলবে। কিন্তু ইতোমধ্যেই হারু ঘোষের স্ত্রী যশোধার শিশু বাচ্চা তিনুর ক্ষুধার জ্বালা সচক্ষে দেখে সহ্য করতে না পেরে চালগুলো যশোধাকে হারুর স্ত্রী ধার দিয়েছিল। একথা জানার পর রাগান্বিত কণ্ঠে হারু ঘোষ বলল–

> কে বলেছিলে ওদের দয়া করতে? ওদের ছেলে মারা গেলে আমাদের কি? নিজেরাই খেতে পায়না, আবার দান-খয়রাত, ওদের চাল দেয়ার চেয়ে বেড়াল-কুকুরকে চাল দেয়া ঢের ভালো..., চাল কি সস্তা হয়েছে, না বেশি হয়েছে, যে তুমি আমায় না বলে চাল দাও।[৬]

হারু ঘোষের নেতিবাচক কথাগুলো নিলু ঘোষ আড়াল থেকে শুনতে পায়। সে রাগে এবং ক্ষোভে যশোধার চুলের মুঠি ধরে বেদম প্রহার করতে থাকে। এক পর্যায়ে অন্তঃসত্ত্বা যশোধা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ভোররাতে দুনিয়ার সকল মায়া ছেড়ে সে বিদায় নেয়। অপমৃত্যু ঘটে তার গর্ভের সন্তানের। ঘটনার আকস্মিকতায় নিলু ঘোষ স্তব্ধ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি দিয়ে সে দুর্ভিক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে।[৭]

সুকান্তের ছোটগল্প 'দুর্বোধ্য' থেকেও দুর্ভিক্ষের তথ্য পাওয়া যায়। এ গল্প থেকে জানা যায় রেলস্টেশনের পাশে তেঁতুল গাছের তলায় একটা অন্ধ লোক ভিক্ষা করতো। তার আয়

রোজগারও হতো ভালো। কিন্তু এক সময় তার আয় রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। এতে অন্ধ লোকটি বুঝতে পারল দেশ দুর্ভিক্ষ কবলিত। জনগণ নিজেরাই খেতে পাবে না অন্ধকে ভিক্ষা দিবে কে? ভিক্ষা না পেয়ে সে যতটা না কষ্ট পায় তার চেয়েও বেশি কষ্ট পেল যখন শুনলো ঘনশ্যামের বউ চাল কিনতে গিয়ে চাল না পেয়ে জলে ডুবে মারা গেছে। এদিকে টানা দু'দিন অন্ধ বুড়ো কিছু খেতে না পেয়ে ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে যায়। বিকেলের দিকে যখন সে ক্লান্ত, অবসন্ন তখন হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো 'অন্ন চাই বস্ত্র চাই'। অগণিত জনতার ক্ষুধার যন্ত্রণা সে প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে লাগলো। সে বিপুল উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালো হাজার জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একবার মাত্র 'অন্ন চাই' বলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।[৮] তেতাল্লিশের মন্বন্তরে বাংলার প্রতিটি মানুষের অন্নই ছিল প্রথম চাহিদা।

সুকান্তের 'দরদী কিশোর' গল্পেও আছে মন্বন্তরের বাস্তব চিত্র। এ গল্প থেকে জানা যায় চালের জন্য যখন গোটা দেশে মারামারি কাটাকাটি তখন শতদ্রু নামে এক কিশোর নিরন্ন মানুষকে সাহায্যের জন্য 'কিশোর বাহিনী' নামে এক ভলান্টিয়ার দল গড়ে তোলে। ভলান্টিয়ার দলের সদস্যরা একদিন শতদ্রুদের বাড়ি এসে তার বাবাকে বলে–

> আমরা কিশোর বাহিনীর ভলান্টিয়ার। আপনার ছেলের মুখে শুনলাম আপনি নাকি ষাট মণ চাল বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন, সেগুলো বস্তির জন্য দিতে হবে। আমরা অবশ্য আধা দরে আপনার চাল বিক্রি করে ষাট মণের দাম দিয়ে দিবো। আর তাতে রাজি না হলে আমরা পুলিশের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হবো না।[৯]

নিরুপায় হয়ে শতদ্রুর বাবা চালের গুদাম খুলে দেয়। কিন্তু শতদ্রুর বাবা প্রচণ্ড রাগে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছেলেকে বেদম প্রহার করে। অবশ্য শতদ্রুর এতে কোন কষ্ট নাই। ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে হাসি দেখে সে পরম সুখ অনুভব করে। সুকান্তের 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্পেও দুর্ভিক্ষের চিত্র পাওয়া যায়। এ গল্পে দুর্ভিক্ষতাড়িত পরাধীন বাংলা মায়ের চরম দুরবস্থা এবং সেই মায়ের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের কথা ব্যক্ত হয়েছে। বয়স্করা যখন স্বদেশের স্বার্থ পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে তখন কিশোররাই মাতৃভূমিকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিচ্ছে। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'কিশোরের স্বপ্ন' গল্প থেকে আরো জানা যায়, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসের মহাদুর্দিনে বয়স্কদের উপর নির্ভর না করে জয়দ্রথের মতো উদ্যমী কিশোরের নেতৃত্বে তরুণ সমাজ দুর্ভিক্ষ মোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।[১০]

(খ) বন্দে আলী মিয়া

কবি বন্দে আলী মিয়ার 'নারী কলঙ্কময়ী' গল্পগ্রন্থের ছোটগল্প 'অন্নের দাম' তেতাল্লিশের মন্বন্তরের করুণ কাহিনীর একটি স্ফূলিঙ্গ। এ গল্প থেকে তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে সাধারণ মানুষের করুণ চিত্রের বিবরণ জানা যায়। অভাবে মানুষ খেতে না পেয়ে কচুসিদ্ধ ও গাছের

পাতা খেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। এক পর্যায়ে গাছের পাতা ও কচু ফুরিয়ে যায়। তখন চলতে থাকলো ঘরে ঘরে অনাহার। কারো দুয়ারে একটু ভাতের ফেনের প্রত্যাশা করেও পাওয়া গেল না। ক্ষুধার যাতনায় গ্রামের লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে শহরে চলল দু'টো দানার প্রত্যাশায়। তবে যাদের ঘরে অবিবাহিত যুবতী কন্যা ছিল, তরুণী বিধবা বোন ছিল, অথবা সুন্দরী স্ত্রী ছিল তারা শহরে না গিয়ে নিজ বাড়িতে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে থাকলো। বন্দে আলী মিয়া তার ছোটগল্প 'অন্নের দাম' এ কোন এক গ্রামের দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের কথা তুলে ধরেছেন। গ্রামের অধিবাসীরা সকলে গরিব। চিরকাল তারা পরের বাড়িতে মজুরী খেটে দিন কাটায়। ঐ গ্রামে রাজীব লোচন নামে একজন নায়েব বাস করতো। তার অবস্থা অনেকটাই ভালো। সে সর্বদা খোরশেদ পাইককে সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতো। কিন্তু নায়েব মশাই ছিল লম্পট প্রকৃতির লোক। নায়েব মশাইয়ের প্রতিবেশী ছিল নটবর দাশ। তার ঘরে ছিল দুই যুবতী কন্যা। দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে লম্পট নায়েব নটবরের বাসায় আসে এবং তাকে প্রতিদিন এক সের করে চাল দিতে রাজি হয়। নটবর তার ১৮/১৯ বছরের মেয়ে মালতীকে নায়েবের সঙ্গে পাঠায় চাল আনতে। নটবর ভালোভাবেই জানতো মালতী তার নারীধর্মকে অক্ষত রেখে ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু শুধু এক মুষ্ঠি অন্নের জন্য পিতা হয়ে নটবর তার যুবতী কন্যাকে নরশার্দুলের গহ্বরে পাঠায়।[১১] সন্ধ্যার পর মালতী চাল নিয়ে ঠিকই ফিরে আসে। কিন্তু ঘরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। নটবরের বুঝতে আর কিছু বাঁকি থাকলো না। কিন্তু পাঁচ দিন উপোশ থাকা নটবরের কিছুই করার ছিল না। মালতীর ১৫/১৬ বছরের ছোট বোন ক্ষেঁদী ঘটনার বিবরণ জানতে চাইলে মালতী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বলে–

> চাল আনতে আমি আর যাবো না রে, নায়েব লোকটা ভারী বদমায়েস। চাল দেবার জন্য একটা ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। পাইকটা দরজা বন্ধ করে দিলে। আমি আর যাবো না।[১২]

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে এ রকম অসংখ্য মালতী এক মুঠো অন্নের জন্য তাদের সতীত্ব বিসর্জন দেয়। 'অন্নের দাম' ছোটগল্প থেকে আরো জানা যায় ক্ষুধার্ত মহিলারা উদারন্নের সন্ধানে প্রতি রাতে কখনো দলবদ্ধ হয়ে আবার কখনও পৃথকভাবে খাদ্য সংগ্রহের জন্য বের হয়। কেহ হয়তো এক সানকি ভাত দেয়। কেহবা দু'মুঠো চাল, কেহবা দু'চার আনা পয়সা। শূন্য হাতেও কাউকে ফিরতে দেখা যেত। এভাবে রাতের বেলায় অন্নের সন্ধান করতে ক্ষেঁদীকেও মালতীর পরিণতি ভোগ করতে হয়। একদা প্রভাতের আধো আধো আঁধারে নটবর ঝোঁপের অন্তরাল থেকে দু'জন মহিলাকে বের হতে দেখে। নারী দু'জনের মধ্যে একজন ছিল তার কনিষ্ঠা কন্যা ক্ষেঁদী। সবকিছু জানার পর নটবরের মনে হলো ধরণী দ্বিধা হলে সে পরিত্রাণ পায়। দুই অবিবাহিতা কন্যার অসৎ উপার্জন দ্বারা তাকে জীবনধারণ করতে হচ্ছে। এর চেয়ে নৈতিক অধ:পতন আর কী হতে পারে! তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের মরণ কামড় এতটাই

তীব্র ছিল যে বাংলাদেশের প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষকে অনাহারে জীবন দিতে হয়েছিল। অনেক মহিলাকে মালতী, ক্ষেঁদীর মত ইজ্জত-আব্রু বিসর্জন দিতে হয়েছিল। আবার গ্রামবাংলার অসংখ্য বাবাকে শুধু একমুঠো অন্নের জন্য নটবর দাসের মত বিশ্রী অভিজ্ঞতা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়েছিল।[১৩]

(গ) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলাদেশে এক অভাবনীয় পৈশাচিক জৈবিক ক্ষুধা জেগে ওঠে। অসাধু ব্যবসায়ীদের শোষণ ও ঘুষখোর প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সহযোগিতা মন্বন্তরকে আরো প্রকট করে তোলে। ক্ষুধাকে নিবৃত্তি করে একমুঠো অন্নের আশায়, এক বাটি ভাতের ফেনের আশায় নিরন্ন মানুষের দল রাস্তার বুকে ভিড় জমাতে থাকে। দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার মানুষের অবস্থাকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার একাধিক ছোট গল্পে তুলে ধরেছেন। তার রচিত 'নক্রচরিত' 'দুঃশাসন' 'হাড়', 'ডিনার' এবং 'ভাঙ্গা চশমা' ছোটগল্প তেতাল্লিশের মন্বন্তরের জলন্ত প্রতিচ্ছবি।[১৪]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'নক্র' ছোটগল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিশিকান্ত ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তিনি এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি। দুর্ভিক্ষের সময় নিশিকান্ত ইব্রাহিম দারোগাকে ঘুষ দিয়ে দাপোটের সাথে অন্যায় অসৎকর্ম চালিয়ে যেতে থাকে। অধিক লাভের আশায় কালোবাজারী করে ৮০০ মণ ধান তার গোলায় মজুত রাখে। অথচ তার গ্রামের মতিলাল ও তার স্ত্রী ক্ষুধার জ্বালা সইতে না পেরে আত্মহত্যা করে।[১৫] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' ছোটগল্পে দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র লক্ষ্য করা যায়। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দেবী দাস। সে কাপড়ের আড়তদার। 'নক্রচরিত' গল্পে নিশিকান্তের সাথে দেবী দাসের চরিত্রের হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ গল্পেও শচীকান্ত নামে এক দারোগাকে দেখা যাচ্ছে। তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল 'নক্রচরিত' গল্পের দারোগা ইব্রাহিমের অনুরূপ। দারোগা শচীকান্ত অবৈধভাবে উপার্জিত টাকায় গ্রামে যাত্রাপালার আয়োজন করে। যাত্রাপালার নাম দেয়া হয়েছিল 'দুঃশাসনের রক্তপান'। দারোগা শচীকান্ত যাত্রাপালায় আরোতদার দেবী দাসকে অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানায়। অতিথির সম্মান অর্জনের জন্য অবশ্য দেবী দাসকে ৫০ টাকা চাঁদা দিতে হয়েছিল। যাত্রাপালা শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে দেবী দাস ও তার ভাইপো গৌরদাস এক ষোড়শী মেয়েকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় ঘাট থেকে জল সংগ্রহ করতে দেখে। প্রকৃতপক্ষেই এই দৃশ্য ছিল তেতাল্লিশের মন্বন্তরের এক নগ্ন রূপ।[১৬] লেখকের 'হাড়' গল্পেও গ্রামবাংলার মন্বন্তরের নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক চিত্র পাওয়া যায়। বিশ্বযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ কবলিত কলকাতার মানুষ তেতাল্লিশের মন্বন্তরে ডাস্টবিন থেকে কুকুরের সাথে প্রতিযোগিতা করে খাবার সংগ্রহ করছে এমন দৃশ্যও 'হাড়' গল্প থেকে জানা যায়।[১৭]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মানুষ অনাহারে মারা গেছে এখানেই শেষ নয়। মানুষ তাদের নৈতিকতাও বিসর্জন দিয়েছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডিনার' গল্পে সে রকমই চিত্র লক্ষ্য করা যায়। 'ডিনার' গল্পের মূল চরিত্র রমাপতি। অবৈধভাবে টাকা কামানোর জন্য সে সিনেমার ব্যবসা শুরু করে। পার্শ্বচরিত্র নায়িকাদের খুঁজে আনা ছিল তার প্রধান কাজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে খুব অল্প পয়সায় সমগ্র কলকাতার নিষিদ্ধ পল্লী থেকে মেয়েদের এনে সিনেমার পার্শ্ব চরিত্ররূপে কাজ পাইয়ে দেবার ব্যবসা করতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যেই অবৈধ পয়সায় ফুলে ফেঁপে ওঠে রমাপতি। পয়সার লালসা তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীন মানুষে পরিণত করে। নিজের কর্মসিদ্ধির জন্য আপন ভাইজি চম্পাকে ইংরেজ সাহেবের ভোগ্য পণ্যতে বেছে নিতেও তার মানবিকতায় বিন্দু মাত্র বাধেনি।[১৮] তেতাল্লিশের মন্বন্তরে এ রকম হাজার রমাপতির আবির্ভাব ঘটে। আর তাদের কল্যাণে দুর্ভিক্ষের ধোঁয়া বিষন্ন বাংলার আকাশে রক্তের অক্ষরে অভিশপ্ত স্বাক্ষর হিসেবে ১৯৪৩ সালকে রেখে যায়।[১৯] তবে শতকরা একজন বা হাজারে একজন লোক ছিল যারা অনাহারে ক্ষুধার সাথে পাঞ্জা লড়েছে কিন্তু নীতি বিসর্জন দেয়নি। এমনি একজন শিক্ষকের চরিত্র দেখা যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাঙ্গা চশমা' গল্পে। এলাকার লোকেরা এ শিক্ষককে 'পাগল স্কুল মাস্টার' বলে ডাকতো। কারণ তিনি তার সমস্ত সহায় সম্বল বিসর্জন দিয়ে একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভিক্ষ আসার পর না খেয়ে অনেক ছাত্র মারা যায়। বাঁকিরা শহরে পালিয়ে যায়। এক পর্যায়ে স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। পাগল স্কুল মাস্টারও বেকার হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষপীড়িতদের রিলিফের জন্য নিয়োজিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে[২০] এক প্রকার জোর করেই পাগল স্কুল মাস্টার তার স্কুলে নিয়ে আসেন। বিদ্যালয়টি দেখিয়ে পাগল মাস্টার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন–

> এই আমার স্কুল সারাজীবন তিল তিল করে গায়ের রক্ত দিয়ে একে গড়ে তুলেছিলাম। বউয়ের হার বিক্রি করে চালা উঠিয়েছি। মনে আশা ছিল দেশের সমস্ত ছেলেদের লেখাপড়া শিখাবো, হেডমাস্টার হবো। কিন্তু স্যার কেন এলো দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেলো আমার ছাত্ররা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারাজীবনের সবকিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিল বলতে পারেন।[২১]

তেতাল্লিশের মন্বন্তর এমন হাজারো পাগল স্কুল মাস্টারের স্বপ্নকে ধুলিসাৎ করে দিয়েছিল।

কাব্য-কবিতা

(ক) মঈনুদ্দীনের *আর্তনাদ*

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের বাস্তব পরিস্থিতি এমন হয়েছিল যে, অনাহারে তাদের দেহে কোন মাংস ছিল না। হাড়গুলো শুধু চামড়া দিয়ে ঢাঁকা ছিল। এমনই সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন মঈনুদ্দিন তার *আর্তনাদ* কাব্যে। তার কাব্যগ্রন্থ থেকে জানা যায় দুর্ভিক্ষে

আক্রান্ত দুঃখিনী গদার মায়ের মৃত্যুর করুণ কাহিনী। মন্বন্তরের সময় ষাটোর্ধ বুড়ি গদার মা ছয় মাস ভাতের মুখ দেখেনি। অনেক কষ্টে নতুন ধানের মৌসুমে সে কুড়িয়ে কিছু ধান সংগ্রহ করে এবং ভিক্ষাবৃত্তি করে পায় দু'আনা পয়সা। উদর পূর্তি করে খাবে বলে দু'আনায় মাছ কিনে কুড়ানো ধানের চালে মাছভাত রান্না করলো। গোসল করে পরম উৎসাহে ভাতের থালা কাছে টেনে নেয়। কিন্তু অভুক্ত শীর্ণ দেহ অকস্মাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভাতের থালার উপর। গদার মা ভাত না খেয়েই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।[২২] তেতাল্লিশের মন্বন্তরে এরকম লাখো বুভুক্ষু গদার মা জীবন দিয়েছিল। সরকার লঙ্গরখানা খুললেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই কম। এছাড়াও লঙ্গরখানায় শিশুদের জন্য আলাদা কোন বরাদ্দ ছিল না। তাই ক্ষুধার্ত মা খেতে দিতে না পেরে তার কোলের সন্তানকে আছড়ে মেরে ফেলেছে এ দৃশ্যও দেখা গেছে। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে অসাধু মজুতদাররা চালের কৃত্রিম সংকট তৈরী করে দুর্ভিক্ষকে আরো প্রকট করে তুলেছিল। তাদের কাছে জনগণের জীবনের চেয়ে অধিক মুনাফাই ছিল মুখ্য। মঈনুদ্দীন 'আর্তনাদ' কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সে দৃশ্য–

অষ্টমুদ্রা ব্যয়েতে আড়তদার,
চাল ক্রয় করি করেছে গুদামজাত
সাধ না ছাড়িতে পঞ্চাশ টাকা পেলে
অতি লোভে আছে আশির আশায় বসি।[২৩]

ক্ষুধার্ত মানুষ জঠরের যাতনায় নর্দমা, ডাস্টবিনেও খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরে বেড়িয়েছে। কবি মঈনুদ্দীনের বর্ণনায় পাওয়া যায়–

ডাস্টবিনে লোলুপ দৃষ্টি হানি,
খুঁজে খুঁজে ফেরে একটি অন্ন কণা,
যদি পড়ে থাকে পত্র অন্তরালে,
চিবানো ডাটার একটু রসের শেষ।[২৪]

কবির এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তেতাল্লিশের মন্বন্তরে মানুষ আর কুকুরের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়েছিল। ফুড কমিটির লম্পট সেক্রেটারি এক চামচ্ খিচুরী বেশি দেওয়ার কথা বলে রাতের অন্ধকারে জাহেদার সতীত্ব কেড়ে নেয় এমন লোমহর্ষক ঘটনার বিবরণও মঈনুদ্দীনের বর্ণনা থেকে জানা যায়। অর্থাৎ তেতাল্লিশের মন্বন্তর বাংলার ইতিহাসে মানবতার সবচেয়ে বড় অভিশাপ হিসেবে হাজির হয়েছিল।

(খ) বন্দে আলী মিয়ার কবিতা

বাংলা সাহিত্যের কবিতায় বিভিন্ন কবি দুর্ভিক্ষের চিত্র অংকন করেছেন। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে কবি বন্দে আলী মিয়া দু'টো কবিতা লিখেছেন। কবিতা দু'টোর নাম পঞ্চাশের

মন্বন্তর (১) ও পঞ্চাশের মন্বন্তর (২)। তার বিখ্যাত কবিতায় তিনি শহর ও গ্রামের নিরন্ন মানুষের ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন। এক মুষ্ঠি ভাতের জন্য দুর্গত মানুষের হাহাকার কবির বর্ণনায় ফুটে উঠেছে। এ হাহাকার যেমন করুণ তেমনি বেদনার। তিনি পঞ্চাশের মন্বন্তর (১) কবিতায় বলেছেন–

'অন্ন দাও–অন্ন দাও' দ্বারে দ্বারে ফেরে দুগর্তদল
পরণে জীর্ণবাস রুদ্ধ বাষ্পে নয়ন সজল
ধনীর প্রাসাদ তলে ক্ষুধাতুর কেঁদে হল সারা
এক মুষ্ঠি অন্ন লাগি জনে জনে প্রাণ দিল তারা।[২৫]

তেতাল্লিশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অগণিত নারী তাদের সম্ভ্রম বিসর্জন দিয়েছিল। দুধের অভাবে শিশুরা মায়ের বুকেই পড়ে মরে থাকে। তাই কবি বন্দে আলী মিয়া কবিতার পঙ্কতিতে উল্লেখ করেছেন–

ভাগ্যের নিষ্ঠুর চক্র অবিরাম ঘেরে পলে পলে
নিপীড়িত গণদেবপিষ্ঠ হয় তার পদতলে
নারীর ইজ্জত নাই-বুভুক্ষা হরেছে সরম
এক ফোঁটা দুগ্ধতরে
শিশু মরে মার বক্ষ পরে।[২৬]

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ বাংলার বুকে নেমে এসেছিল মানবতার অভিশাপ হিসেবে। এই দুর্ভিক্ষ ক্ষুধার্ত মানুষ তার লাজ লজ্জাকে বিসর্জন দিয়েছিল। বিসর্জন দিয়েছিল নারী তার সতীত্বকে। অনেক লোক জীবিকার তাড়নায় ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিল। কিন্তু হায়! কপাল তাদের ভাগ্যে ভিক্ষাও জুটত না। ভাতের অভাবে মানুষ কচু ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটাতে থাকে। কবির বর্ণনায় সেই করুণ কাহিনী ফুঠে উঠেছে তাঁর পঞ্চাশের মন্বন্তর কবিতা (২) এ–

সহিতে না পারি মরিয়া হইয়া জঠরের যাতনায়
কচু তুলে তুলে সেদ্ধ করিয়া সকলে তাহাই খায়।
খানা ও ডোবার কচু ফুরাইল গাছের রলো না পাতা
দিনে দিনে তাও শেষ হয়ে এলো ফুরালো ব্যাঙের ছাতা।[২৭]

বুভুক্ষু মানুষের সংখ্যা দিন দিন এত বাড়তে থাকে যে, কঁচু ঘেঁচু খাওয়ার পর তারা গাছের পাতা পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখেনি। খাদ্যাভাবে হতভাগারা রোজ উপবাসের মধ্যে থাকে। এভাবে অসংখ্য নারী পতিহারা হয়। কেউবা হয় পিতৃহারা, কেউবা শিশু সন্তানকে হারিয়ে বুকে চিতার আগুন জ্বালিয়ে বেঁচে থাকে। একজন মায়ের কাছে সন্তান সবচেয়ে প্রিয়। অথচ তেতাল্লিশের মন্বন্তরে মা খেতে দিতে না পেরে গর্ভজাত সন্তানকে মেরে ফেলেছে এমন লোমহর্ষক বিবরণও কবির বর্ণনায় পাওয়া যায়। বাংলার মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই অপরের

প্রতি সহনশীল। এখানে আত্মিক সম্পর্ক অন্যান্য দেশের চেয়েও অনেকটা সুদৃঢ়। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে যারা মারা যায় তারা ক্ষুধার জ্বালা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। আবার যারা বেঁচে ছিল তারাও ক্ষুধার জ্বালা নিয়েই বেঁচে ছিল। অথচ এই মহাদুর্যোগেও তারা একে অপরের প্রতি সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিবেশি বা নিকট আত্মীয়ের মৃত্যুতে করুণ আর্তনাতে ফেঁটে পড়েছে। একজনের মৃত্যু দেখে যেনো আর একজনকে বিলাপ করতে না হয় সেজন্য তারা মহান স্রষ্টার কাছে একসঙ্গে মরার জন্য আবেদন জানিয়েছে। তাদের সেই আবেদন কবি বন্দে আলী মিয়া কবিতার রংতুলিতে প্রকাশ করেছেন এভাবে–

লক্ষ কণ্ঠ বলিছে ফুকারী, দয়া করো ভগবান
এমন করিয়া দগ্ধে দগ্ধে বধিও না অনুখন।
বাঁচিতে চাহিনা– মৃত্যু দাওগো একসনে সবাকার
একের মরণ দেখিয়া অপরে করিবে না হাহাকার।[২৮]

(গ) ফররুখ আহমদের কবিতা

কবি ফররুখ আহমদ মন্বন্তরকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন।[২৯] ১৯৪৩ সালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর নির্মম উদাসীনতাও মন্বন্তরের জন্য দায়ী। কারণ সরকারের উদাসীনতার সুযোগে স্বার্থান্বেষী ব্যবসায়ীচক্র গোপন মজুদের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে কালোবাজারী শুরু করে। ফলে চাউলের দাম স্বাভাবিকের বাজারের চেয়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি পায়। ফররুখ আহমদের দৃষ্টিতে এ সকল কালোবাজারীরা ছিল বিকৃত পশু। আর এ সকল বিকৃত পশুদের কারসাজিতে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে অগণিত মানুষ অনাহারে মারা যায়। তাই ব্যথিত চিত্তে কবি ফররুখ আহমদ 'কালো দাগ' কবিতায় বললেন–

অসাড় গলিতে কুণ্ঠে প্রাণহীন মৃতের মিছিলে
কুৎসিত কামনা আর পাশবিক লোভে ম্রিয়মান...
ঘনতর অন্ধকারে (কোথা পাব মুক্তির পরাগ?
মানুষের মৃত্যু হলো বিকৃত পশুর পদতলে)॥[৩০]

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে যখন আপন পিতা-মাতা সন্তানকে গলাটিপে মেরে ফেলেছে, যুবতী কন্যাকে টাকার লোভে তুলে দিচ্ছে নারী ব্যবসায়ীর হাতে, ক্ষুধার কাছে পরাজিত মানুষ উচ্ছিষ্টের অন্বেষণে ঝাঁপিয়ে পড়ছে নর্দমায় তখন বিশ্ব সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়ে ফররুখ আহমদ বললেন–

এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে
করে পরিহাস?

কোন ইবলিশ আজ মানুষের ফেলি মৃত্যুপাকে
করে পরিহাস?
কোন আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?
ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসরে
কোন প্রেত অট্টহাসি হাসে?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে।[৩১]

ফররুখ আহমদ দুর্ভিক্ষ কবলিত সভ্যতাকে একটা জড় সভ্যতা বলে উল্লেখ করেছেন এবং ধ্বংস হওয়ার জন্য অভিশাপ দিচ্ছেন। তাই 'লাশ' কবিতার সর্বশেষ চরণে তিনি মানব সভ্যতাকে কটাক্ষ করে বলছেন–

আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও:
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও॥[৩২]

ফররুখ আহমদের *হে বন্য স্বপ্নেরা* কাব্যগ্রন্থের বেশ কিছু কবিতা থেকে দুর্ভিক্ষের চিত্র পাওয়া যায়। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষে বাংলার অসংখ্য গ্রাম মৃত্যুপুরিতে পরিণত হয়। সেই করুণ দৃশ্যই ফররুখ আহমদ তুলে ধরেছেন তার 'সমাপ্তি' কবিতায়–

এখানে মানুষ ছিল আজ শুধু পড়ে আছে শব।
আমরা তো শববাহী যাত্রীদল চলেছি অশেষ,
এ শবের জীবাণুতে পান করি বিষাক্ত নিমেষ
শুনে যাব বেলাশেষে পিপাসার তৃপ্তিহীন রব।[৩৩]

তেতাল্লিশের মন্বন্তরে অসংখ্য রমনীকে সম্ভ্রম বিসর্জন দিতে হয়েছিল। ক্ষুধাশীর্ণ শিশুর কান্না মায়ের পক্ষে থামানো সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত জমের হস্তক্ষেপে তাদের কান্না বন্ধ হয়। তেতাল্লিশের মন্বন্তরে এত অধিক মানুষের প্রাণহানি ঘটে যে গোটা দেশটাই যেন মহাশ্মশানে রূপ নেয়। ঠিক এমনই দৃশ্য ফররুখ আহমদের 'পদ্মার ভাঙ্গন', 'পরিপ্রেক্ষিত' এবং 'শূন্য মাঠ', 'মরা ঘাস' কবিতায় ফুঠে উঠেছে।[৩৪] ফররুখ আহমদ তার *হে বন্য স্বপ্নেরা* কবিতাগ্রন্থে মোট ১৬টি কবিতায় দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরেছেন। এ সময় কবি কলিকাতায় থাকতেন। তাই দুর্ভিক্ষকে খুব কাছ থেকে তিনি দেখার সুযোগ পেয়েছেন। আর এ জন্যই ফররুখ আহমদ বাংলা কাব্যাঙ্গনে দুর্ভিক্ষের শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন।

(ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা

বাংলা সাহিত্যের তরুণ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বিশ শতকের চল্লিশের দশকের একজন শক্তিমান কবি ছিলেন। তিনি তার অসংখ্য কবিতায় মন্বন্তরের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি তার বিখ্যাত 'ঐতিহাসিক' কবিতায় বিশ্ব আদালতে কৈফিয়ত চেয়েছিলেন এভাবে–

আজ এসেছি তোমাদের ঘরে ঘরে–
পৃথিবীর আদালতের পরোয়ানা নিয়ে
তোমরা কি দেবে আমার প্রশ্নের কৈফিয়ত,
কেন মৃত্যুকীর্ণ শবে ভরলো পঞ্চাশ সাল?[৩৫]

কবি তাঁর কৈফিয়তের কোন জবাব পাননি। কারণ কবি তাঁর প্রশ্নের কৈফিয়ত খুঁজতে গিয়ে পৃথিবীর আদালত স্তব্ধ হয়ে গেছে। তবে কবির দৃষ্টিতে বাংলাদেশের জনগণ মন্বন্তরের শিক্ষা থেকে ঐক্যহীন বিশৃঙ্খলা ডিঙ্গিয়ে শৃঙ্খলার পথ খুঁজে পেয়েছিলেন। তেতাল্লিশের পুরো সময়টাই (১৩৪৯-১৩৫০) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কন্ট্রোলের দোকানের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শৃঙ্খলার সাথে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। ফলে হতভাগ্য নিরন্ন মানুষের মনোপেশির জগতে একটা পরিবর্তন এসেছিল যা তাদেরকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছিল। তাই কবি বলেছেন–

একদা দুর্ভিক্ষ এলো
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়ালে একই লাইনে
ইতর-ভদ্র, হিন্দু আর মুসলমান
একই বাতাসে নিলে নিঃশ্বাস।
চাল, চিনি, কয়লা, কেরোসিন?
এসব দুষ্প্রাপ্য জিনিসের জন্য চাই লাইন।
কিন্তু বুঝলে না মুক্তিও দুর্লভ আর দুর্মূল্য,
তারও জন্যে চাই চল্লিশ কোটির দীর্ঘ, অবিচ্ছিন্ন এক লাইন।[৩৬]

তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ সংঘটনে ঔপনিবেশিক শাসন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেমন দায়ী ছিল তেমনি দেশীয় জোতদার ও মহাজনরাও সমানতালে অবদান রেখেছিল। সুদখোর মহাজনদের মৃত্যুর ফাঁদে আটকা পরে অনেকেই স্বজনহারা হয়েছিল। স্বজনহারা ক্ষুধার্ত মানুষ অসাধু মজুতদার ও জোতদারদেরকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার আক্রোশে ফেটে পড়েছিল। নিরন্ন মানুষের আক্রোশ তার 'বোধন' কবিতায় প্রকাশ করেছেন এভাবে–

শোন রে মালিক, শোন রে মজুতদার!
তোদের প্রাদাসে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড়–
হিসাব কি দিবি তার?
প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙ্গেছিস ঘরবাড়ি,
সে কথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনও ভুলতে পারি?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের

চিতা আমি তুলবই।
শোন রে মজুতদার
ফসল ফলানো মাটিতে রোপন
করব তোকে এবার।[৩৭]

অন্ন হচ্ছে মানুষের মৌলিক চাহিদা। তাই কবিতার মধ্যে যতই স্নিগ্ধতা ও নান্দনিকতা থাক না কেন মন্বন্তরের ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে সেই নান্দনিকতা ও স্নিগ্ধতা একেবারেই মূল্যহীন। পূর্ণিমার চাঁদের অপরূপ সৌন্দর্যও বুভুক্ষু মানুষের কাছে অর্থহীন। তাই তাঁর 'হে মহাজীবন' কবিতায় ক্ষুধার্ত জনতার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন–

কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি॥[৩৮]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে গোটা দেশে যখন হাহাকার! তখন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দোকানে কালোবাজারী ব্যাপক মাত্রায় বেড়ে যায়। সরকারিভাবে জনগণকে দুর্ভিক্ষের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য রেশন কার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু অনেকেই সেই কার্ড হারিয়ে ফেলে। নিয়মতান্ত্রিকভাবে নতুন কার্ড পেতে সময় লাগত ছয় মাস। আবার উৎকোচ দিলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই নতুন কার্ড সংগ্রহ করা সম্ভব হতো। এভাবে সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা তাদের নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছিল। অভাবের সুযোগে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছিল। বিশেষ করে বিহার এবং উত্তরবঙ্গে দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। কবি সুকান্তের 'ভেজাল' কবিতায় ফুটে উঠেছে এর বাস্তব চিত্র। কবি বলেছেন–

ভেজাল, ভেজাল, ভেজাল রে ভাই, ভেজাল সারা দেশটায়
ভেজাল ছাড়া খাঁটি জিনিস মিলবে নোকো চেষ্টায়।
ভেজাল পোশাক, ভেজাল খাবার, ভেজাল লোকের ভাবনা,
ভেজালেরই রাজত্ব এ পাটনা থেকে পাবনা।[৩৯]

তেতাল্লিশের মন্বন্তর গোটা ভারতবর্ষকে নাড়া দিয়েছিল। আর বাংলার ক্ষেত্রে ছিল এক মহা অভিশাপ। শুধু বাংলা মুলুকেই না খেয়ে মারা যায় প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ। গ্রাম গঞ্জের পাড়া-মহল্লায় যত্রতত্র পড়ে থাকে মৃতদেহ। দুর্ভিক্ষের বারুদে গোটা সমাজ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তেতাল্লিশের মন্বন্তর খাবার সংগ্রহ করতে ক্ষুধার্ত মানুষ শেষ পর্যন্ত নিজেরা শিয়াল কুকুরের খাবারে পরিণত হয়। কৃষকরা দেশান্তরি হওয়ায় তারা কৃষি কাজ ভুলে যায়। জঠরের যাতনায় মা তার দুধের শিশু বিক্রি করে মাতৃস্নেহ বিসর্জন দেয়। অনাহারে অর্ধাহারে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। কোন কোন গ্রামে এমনও অবস্থা দেখা দেয় যেখানে ভিটায় বাতি জ্বালানোর বংশধরই অবশিষ্ট থাকে না। সুকান্ত ভট্টাচার্য তাঁর কাব্যনাট্য 'অভিযান'-

এ উদয়ন, ইন্দ্রসেন, সত্যকাম, কোতোয়াল, সংকলিতা, পথিক, রাজদূত, মহারাজ, কুবের শেঠ এবং জনৈক প্রজা-এ ১০টি চরিত্রের সমন্বয়ে সুন্দরভাবে দুর্ভিক্ষের চিত্র চিত্রায়িত করেছেন। এ কাব্যনাট্যে সংকলিতার বর্ণনা থেকে জানা যায়–

চাষী ভুলে গেছে চাষ, মা তার ভুলে গেছে স্নেহ,
কুটিরে কুটিরে জমে গলিত মৃতের দেহ;
উজাড় নগর গ্রাম কোথাও জ্বলে না বাতি,
হাজার শিশুরা মরে, দেশের আগামী জাতি।[৪০]

সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই কাব্যনাট্যে ইন্দ্রসেন শপথ বাক্য পাঠ করে বলছেন–

রাজার ওপর আর করব না নির্ভর
আমাদের ভাগ্যের আমরাই ঈশ্বর।[৪১]

সুকান্তের এই কাব্যনাট্যে জনগণের মধ্যে অন্যায়ের প্রতিবাদ এমনভাবে ফুটে উঠেছিল যে তারা রাজশক্তিকে কাছে না পেয়ে তার কোতোয়ালকে ক্ষুব্ধ প্রজারা বন্দী করেছিল এবং সাধারণ জনগণ সমস্বরে একই কণ্ঠে উচ্চারণ করল–

চলবে না অন্যায়, খাটবে না ফন্দি,
আমাদের আদালতে আজ তুই বন্দী!!![৪২]

কবি সুকান্তের দৃষ্টিতে তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুধু মানবতার অভিশাপই ছিল না, এক মহা জঞ্জালও বটে। তার মতে, এই জঞ্জাল অপসারণ করতে না পারলে সমাজের আবহাওয়াও হবে বিষাক্ত, আর পরিবেশটা হবে বসবাসের অযোগ্য। তাই তিনি বুকে সাহস নিয়ে ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থের 'ছাড়পত্র' কবিতায় দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেন–

চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।[৪৩]

উপন্যাস

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *মন্বন্তর* উপন্যাস থেকে ১৯৪৩ এর মহাদুর্ভিক্ষের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে নিত্য ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রীর দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। সরকার জনসাধারণের কল্যাণে ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু করলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নিতান্ত কম। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ক্রেতাদের জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে হতো। সকালে লাইনে দাঁড়িয়ে ফিরতে হতো

বিকেলে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মন্বন্তর* উপন্যাসে সে চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি বর্ণনা করেছেন–

> রাস্তায় চিনির আর কেরোসিনের কন্ট্রোলের দোকানে এরই মধ্যে সারিবন্দী লোক দাঁড়িয়ে গেছে। বাজারে এখন চিনি এবং কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, জাভা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ থেকে চিনি আসা বন্ধ হয়েছে। ব্রহ্ম দেশ জাপানিদের হাতে; ওখানকার কেরোসিনের উৎস মুখ এদেশের পক্ষে বন্ধ। ময়দাও অমিল হয়ে আসছে। রোজ দাম বেড়ে চলেছে দু'আনা থেকে তিন আনা-তিন আনা থেকে চার-পাঁচ-ছয়, প্রায় লাফে লাফে। কাপড়ের বাজার আগুনের মত উত্তপ্ত... চালের দর আঠারো, আটা পঁচিশ, চিনি মেলে না, কেরোসিনের কিউয়ে দাঁড়িয়ে তেল আনতে এ বেলায় গেলে ও বেলার আগে ফেরা যায় না।[৪৪]

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ আঘাত হানে বাংলার প্রতিটি গ্রামে। অথচ এই বাংলা মুকুল থেকে প্রতিবছর ৩৮ হাজার টন চাল শ্রীলংকায় রপ্তানি করা হতো। ১৯৪২ সালে খাদ্য শস্যের সংকট আশঙ্কা করে রপ্তানির পরিমাণ ১২ হাজার টনে কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় ১৯৪৩ সালে মার্চ মাসে ভারত থেকে চাল রপ্তানি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরও দেশে দেড় মাসের চালের ঘাটতি থেকে যায়। সুষম বণ্টন এবং তড়িৎ আমদানির মাধ্যমে এ ঘাটতি সহজেই পূরণ করা যেত। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী সরকারের যুদ্ধ উম্মাদ মানসিকতার জন্য সেটা সম্ভব হয়নি। সরকারের উদাসীনতার সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ী ও সুদখোর মহাজনদের কারসাজিতে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম সংকট। দু'মুঠো ভাতের অভাবে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায়। এক মুষ্ঠি ভাতের জন্য মানুষকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বিক্রি করতে হয়েছিল। বিক্রি করতে হয়েছিল নারীর সতীত্ব। ধুলায় লুটে পড়েছিল অভিজাত মানুষের আভিজাত্য। জাতপাত ভুলে গিয়ে হিন্দু, মুসলমান, হিন্দুস্থানি, বাঙালি, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ঝিয়ের দল, গৃহস্থ ঘরের বিধবা-সধবা-কুমারী শ্রেণিবদ্ধভাবে এক কাতারে দাঁড়িয়ে কন্ট্রোলের দোকান থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করতো। জঠরের যাতনায় দু'একটি পয়সা সংগ্রহের জন্য মানুষ যেকোন নিচু পেশা গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেনি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মন্বন্তর* উপন্যাসে সে তথ্যই ফুটে উঠেছে–

> ধর্মতলায় রাস্তার ফুটপাতে সারিবন্দী ছেলের দল বসে গেছে জুতো পালিসের সরঞ্জাম নিয়ে। যুদ্ধের বাজারে একদল বালক/ ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়েছে। বিদেশী সৈনিকের দল চলেছে ভিড় করে। তাদের জুতো পালিস করে দিয়ে এরা জীবিকার্জন করছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের অপঘাত-সমাপ্তি, বোধকরি এই মহাযুদ্ধেই সম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই ছেলেদের মধ্যে অবশ্য হিন্দুস্থানী মুচি এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশি– কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখলে বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেও মধ্যে মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

> এদের মধ্যে বর্ণ হিন্দু এমনকি ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ কতজন আছে তার হিসেব কেউ রাখেনি।[৪৫]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি খুব কাছ থেকে ক্ষুধার্ত মানুষদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার বর্ণনা থেকে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন গ্রাম থেকে নিরন্ন মানুষ কলিকাতায় এসে ভিড় জমিয়েছে। তাদের কারণে ফুটপাতে চলা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এই নিরন্ন মানুষ শেষ পর্যন্ত ফুটপাতের উপরই সংসার পেতে বসে। এক দিকে চালের দাম আকাশ ছোঁয়া। অপরদিকে কলিকাতার বাজারে এক টাকার ওষুধ বিক্রি হতো পঁচিশ টাকায়।[৪৬] ফলে অনাহারে এবং মহামারিতে প্রাণ হারায় সমাজের অগণিত মানুষ।

হামিদা খানমের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ *ঝরা বকুলের গন্ধ*

হামিদা খানম ১৯৪৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন বুভুক্ষু মানুষের করুণ মৃত্যু। দেখেছেন ছোট শিশুকে মৃত মায়ের দুধ চুষতে। আরো দেখেছেন ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট খাবার নিয়ে মানুষ আর কুকুরকে টানাটানি করতে। মন্বন্তরের অভিজ্ঞতা তিনি তাঁর স্মৃতিচারণমূলক *ঝরা বকুলের গন্ধ* গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে–

> একদিন জরুরী কাজে পার্ক সার্কাসে যাওয়ার পথে ট্রামটা দাঁড়ালো ক্যাম্বেল হাসপাতালের সামনে। দেখলাম রাস্তার উল্টো দিকের ফুটপাতের দেয়ালে ঠেস দিয়ে এক বৃদ্ধ মৃত্যুর সাথে লড়ছে। কিছুটা দূরে পড়ে আছে একটি অল্প বয়স্ক বউ। কোলের কাছে দু'টি শিশু। বছর আড়াইয়ের শিশুটি চুপ করে বসে। ছোটটি মায়ের গায়ের উপর উঠছে-নামছে আর মায়ের বুকের শুকানো দুধ চুষছে। মা যে মৃত তা বোঝার মত বয়স শিশুটির হয়নি। শিয়ালদহ স্টেশনের এলাকা কলকাতার আশপাশের বুভুক্ষু কঙ্কালসার মানুষগুলো এসে ভরে ফেলেছে। ফুটপাতে মৃতদেহ। ডাস্টবিনে উচ্ছিষ্ট খাবার আর পরে না। সামান্য যা কিছু পরে কুকুর-মানুষে টানাটানি করে।[৪৭]

তেতাল্লিশের মন্বন্তর শুধু কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গোটা বাংলায় আঘাত হানে। ক্ষুধার্ত মানুষ বাঁচার তাগিদে গঞ্জে এসে ভিড় জমাতে থাকে। প্রথম দিকে কেউ কেউ ক্ষুধার্ত মানুষদের খাবার দিলেও একসময় বন্ধ করে দেয়। ফলে অভুক্ত লোকজন ভাতের পরিবর্তে ফ্যান চাইতে শুরু করে। একসময় ফ্যান দেওয়াও বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষুধার্ত মানুষ না খেয়ে হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলে। খাবার সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা নিজ গৃহেই মরে পড়ে থাকে। আবার অনেক মা খেতে দিতে না পেরে নিজের গর্ভজাত সন্তানকে অন্যের কাছে দিয়ে দেয়। হামিদা খানমের বর্ণনায় এ রকম একটি দৃশ্যের বিবরণ পাওয়া যায়–

> ছুটিতে হোস্টেল বন্ধ। আমি বাড়ি গেলাম পাবনায়। সারা পাবনা শহর যেন ঝিম ধরে আছে। লোকে যেন জোরে কথা বলতে ভুলে গেছে। শহরে চাল নেই, ঔষধ নেই, কেরোসিন তেল নেই, শুধু নেই আর নেই। চারদিকে কেমন হাহাকার। সন্ধ্যা হতেই সারা শহর অন্ধকার হয়ে আসছে। তেলের অভাবে মিউনিসিপ্যালিটির বাতিগুলো আর জ্বলে না।... নলেপাড়ার শিশুরা 'মা ফ্যান দেন' বলে আগের মত আর দুয়ারে এসে দাঁড়ায় না, শহরের লোক ফ্যান দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে– ওদেরও পায়ের জোর কমে গেছে। এমনি এক সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির কাজের বয়স্ক মহিলা নবীর মার সাথে এলো নলেপাড়ার এক বউ। সঙ্গে দু'টি ছেলে। একটির বয়স বছর নয়, আর একটি বছর ছয়ের। অনেক সন্তানের জননী তার দু'টি ছেলেকে মার কাছে রেখে যেতে এসেছে খেতে দিতে পারছে না বলে।[৪৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*

বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র পাওয়া যায়। মন্বন্তরের সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন। তার ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দীন ছিলেন শিল্পমন্ত্রী। আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন সিভিল সাপ্লাই মন্ত্রী। জঠরের জ্বালা সইতে না পেরে লাখ লাখ মানুষ শহরে চলে আসে। খাবার নাই, কাপড় নাই। তখন রীতিমত বিশ্বযুদ্ধ চলছে। ইংরেজরা যুদ্ধের জন্য সমস্ত নৌকা বাজেয়াপ্ত করেছে। ধান, চাল সৈন্যদের জন্য গুদামজাত করা হয়েছে। যা কিছু ছিল ব্যবসায়ী অধিকা মুনাফার আশায় কালোবাজারী করে কৃত্রিম সংকট তৈরী করেছে। ফলে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়ীরা দশ টাকার মনের চাল চল্লিশ টাকায় বিক্রি করতে থাকে। এমন দিন নাই রাস্তায় লোকে মরে পড়ে থাকতে দেখা যায়না। দুর্ভিক্ষ মোকাবিলায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী রাতারাতি বিরাট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গড়ে তুললেন। কন্ট্রোল দোকান খোলার বন্দোবস্ত করলেন। গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন। দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানালেন এবং সাহায্য দিতে বললেন। চাল, আটা, গম ত্রাণ হিসেবে পাওয়া গেলেও পরিবহণের সংকট ছিল তীব্র। কারণ ইংরেজ সরকারের কথা হলো বাংলার মানুষের জীবনের চেয়ে যুদ্ধের সাহায্য অগ্রাধিকার পাবে। তাই ট্রেনে যুদ্ধের সরঞ্জাম যাবার পর যদি জায়গা থাকে তবে রিলিফের খাবার যাবে। বঙ্গবন্ধু তেতাল্লিশের মন্বন্তরকে দেখেছেন খুব কাছ থেকে। তিনি তার লেখনীতে দুর্ভিক্ষের লোমহর্ষক বর্ণনা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন–

> ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলাদেশ দখল করে মীর জাফরের বিশ্বাস ঘাতকতায়, তখন বাংলার এত সম্পদ ছিল যে, মুর্শিদাবাদের একজন ব্যবসায়ী গোটা বিলাত শহর কিনতে পারতো। সেই বাংলাদেশের এ দুরবস্থা চোখে দেখেছি যে, মা মরে পড়ে আছে,

ছোট বাচ্চা সেই মরা মার দুধ চাটছে। কুকুর ও মানুষ একসাথে ডাস্টবিন থেকে কিছু খাবার জন্য কাড়াকাড়ি করছে। ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ফেলে দিয়ে মা কোথায় পালিয়ে গেছে। পেটের দায়ে নিজের ছেলেমেয়েকে বিক্রি করতে চেষ্টা করছে। কেউ কিনতেও রাজি হয় নাই। বাড়ির দুয়ারে এসে চিৎকার করছে 'মা বাঁচাও, কিছু খেতে দাও, মরে তো গেলাম, আর পারি না, একটু ফেন দাও' এই কথা বলতে বলতে ঐ বাড়ির দুয়ারের কাছেই পড়ে মরে গেছে।[৪৯]

মন্বন্তরের অন্যান্য সাহিত্যিক উপাদান

ছোটগল্প, নাটক, উপন্যাস, আত্মজীবনী, স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ, কবিতা ও কাব্য ছাড়াও বাংলার অসংখ্য কবিআল ও চিত্রশিল্পী সুন্দরভাবে দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরেছেন। ১৯৪৩ সালে গ্রামবাংলার মানুষের না ছিল খাদ্য, না ছিল কাপড়, না ছিল চাকরি, না ছিল সম্ভাব্য অন্য কোন বাঁচার পথ। একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া তাদের বিকল্প কোন পথ খোলা ছিল না। মন্বন্তরের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরতে কবিআল রমেশ শীল গাইলেন–

দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ি পঁয়ত্রিশ লক্ষ গেল মরি
আবাল বৃদ্ধ মইল কত হাজার হাজার।[৫০]

সমসাময়িক আর এক কবিআল আক্ষেপের সাথে মন্বন্তরের চিত্র চিত্রায়িত করেছেন এভাবে–

পেটে ভাত নেই
হাতে কাজ নেই
ঘরে শিল্প নেই
বিদেশীর জিনিসে চলে ঘর
তাই
গায়ে জ্বর মনে ডর
চাই
কাজ + ভাত = শক্তি।[৫১]

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন দুর্ভিক্ষের নগ্নরূপ তুলে ধরলেন তাঁর 'ম্যাডেনা ১৯৪৩' শিল্পকর্মে। জয়নুল আবেদীন তার ঐতিহাসিক এই শিল্পকর্মের রং তুলিতে এমনভাবে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে চিত্রায়িত করেছেন যা গোটা বিশ্ববাসীর মনকে নাড়া দিয়েছিল। জয়নুল আবেদনীনের আঁকা নিম্নের ছবি তারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

চিত্র : '৪৩-এর দুর্ভিক্ষ ও জয়নুল আবেদিনের চিত্রমালা।

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকেও মন্বন্তরের চিত্র পাওয়া যায়। বিশেষ করে 'প্রবাসী' পত্রিকা দুর্ভিক্ষের তথ্য জানার অন্যতম প্রধান উৎস। দুর্ভিক্ষের ধকল সহ্য করার জন্য বাংলার সরকার এক ইশতেহার ঘোষণা করে। উক্ত ইশতেহারে সরকার কর্তৃক চাউলের মূল্য নির্ধারণ করা হয় মণপ্রতি ১৪ টাকা ১২ আনা।[৫২] ঘোষণায় আরো বলা হয় কোন ব্যবসায়ী নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্য গ্রহণ করলে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হবে। কিন্তু বাস্তবে সরকারি ইশতেহার কার্যকরী হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ সরকারের কঠোর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও চাউলের মণ দাঁড়ায় গ্রামাঞ্চলে ৩২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ৪৯ টাকা।[৫৩] গরিব কৃষকরা তাদের সহায় সম্বল বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়ে পড়ে। একদিকে দুর্ভিক্ষের ধকল, অপরদিকে ভূমিহীনদের সংখ্যা দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয়। অর্ধাহারে, অনাহারে মানুষ দিন কাটাতে থাকে। ক্ষুধার্ত মানুষ ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট নিয়েও কাড়াকাড়ি শুরু করে। সমকালীন একটি পত্রিকা থেকে জানা যায়–

> আবর্জনা ফেলিবার পাত্র হইতে ভিক্ষুকেরা প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য খুঁটিয়ে খায়। একটি ভিক্ষুক রমনী অপর একটি ভিক্ষুক রমনীর সংগৃহীত খাদ্য ছিনাইয়া লওয়ায় শেষোক্ত

> ভিক্ষুক রমনী পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকটির মাথায় একটি লৌহ পাত্র দ্বারা আঘাত করে। ফলে তাহার ক্ষতস্থান হইতে ভীষণভাবে রক্ত পড়তে থাকে এবং রক্তপাতের ফলে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। ক্ষুধা নিপীড়ণের এই দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক।[৫৪]

মন্বন্তরকালে অলিগলি, ফুটপাতে পড়ে থাকতো অগণিত মানুষের লাশ। ক্ষুধার কাছে পরাজিত মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে পারেনি। তাই গলি রাস্তা ও ফুটপাতেই তারা বিছিয়েছিল জীবনের শেষ শয্যা। মূলত তেতাল্লিশের মন্বন্তরের কবল থেকে বাংলার কোন মানুষই মুক্তি পায়নি। বরং অনাহারে এবং মহামারিতে প্রাণ হারায় সমাজের সকল শ্রেণির মানুষ।

উপসংহার

১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ছিল মানবতার চরম অভিশাপ। ঔপনিবেশিক শাসকের চরম অবহেলা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে বাংলা জুড়ে হাজির হয় তেতাল্লিশের মন্বন্তর। ফলে এই মন্বন্তরে অগণিত লোক প্রাণ হারায়। এই করুণ ইতিহাস কবি সাহিত্যিকদের মনে দারুণ রেখাপাত করে। মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যে কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, কাব্য ও নাটকসহ সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে ব্যাপক উপাদান লক্ষ্য করা যায়। এ সকল উপাদানের সমন্বয়ে ছোট পরিসরে একটিমাত্র প্রবন্ধে মন্বন্তরের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তুলে ধরা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। তাই বিদগ্ধ পাঠক মনে অতৃপ্তি থাকা অসম্ভব নয়। কবি গুরু কোন বিশেষ যুগ বা বিশেষ কোন জাতির কবি নন। তিনি সকল যুগ এবং সকল জাতির কবি। তাইতো তাঁর পদবী হয়েছে বিশ্বকপি। মন্বন্তরের দু'বছর আগেই কবিগুরুর মহাপ্রয়াণ ঘটে। অত্যন্ত যৌক্তিক কারণেই তার 'বর্ষাযাপন' কবিতার ক'টি চরণ দিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধের যবনিকা টানা যেতে পারে–

নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ[৫৫]

পরিশেষে বলা যায় মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে বাঙালিদের কাছে ব্রিটিশ শাসকের অসারতা ফুটে উঠেছিল। স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে অনেক বাঙালি নেতাজির 'আজাদ হিন্দ' ফৌজে যোগ দিয়েছিল। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকে নিয়ে জয়নুল আবেদীনের শিল্পকর্ম শুধু জয়নুল আবেদীনকেই খ্যাতি এনে দেয়নি বরং 'আর্টস এণ্ড ক্র্যাফ্টস' এর ইতিহাসে বাংলাদেশও বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ঔপনিবেশিক শাসনামলে (১৭৬৯-১৯৪৩ খ্রি., ১১৭৬-১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) অনেকবার বাংলায় দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয়। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্যোগ ছিল ১৭৬৯-'৭০ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) এবং ১৯৪৩ (১৩৪৯-'৫০ বঙ্গাব্দ) সালের মহাদুর্ভিক্ষ। এ সকল দুর্যোগে কত লোক মারা যায় তার সঠিক পরিসংখ্যান বলা কঠিন। পণ্ডিতদের মতে ১১৭৬ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মারা গিয়েছিল। আর ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে মারা যায় দুই থেকে আড়াই মিলিয়ন লোক। অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষে বাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ হারায়। উৎস : W.B. Arthur and G. Mc Nicoll, *An Analytical Surey of Population and Development in Bangladesh* (1976), 29; উদ্ধৃত: সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৭০৪-১৯৭১*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩), ৫৬৪, সারণি ২ দ্রষ্টব্য।

২. বিজন ভট্টাচার্য, *নবান্ন* (ঢাকা : সালাহউদ্দিন বই ঘর, ২০১৬, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য), ৬৫।

৩. নুরুল মোমেন, *নেমেসিস* (ঢাকা : বুকস্ ফেয়ার, ২০১৪), ১২।

৪. *প্রাগুক্ত*, ১২।

৫. *প্রাগুক্ত*, ৩২।

৬. এম. রায়হান (সম্পা.), *সুকান্ত সমগ্র* (ঢাকা : দ্যা স্কাই পাবলিশার্স), ১৬৭।

৭. *প্রাগুক্ত*।

৮. *প্রাগুক্ত*, ১৭০।

৯. *প্রাগুক্ত*, ১৭২।

১০. *প্রাগুক্ত*, ১৭৪।

১১. আলাউদ্দিন আল আজাদ (সম্পা.), *বন্দে আলী মিয়া রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৮), ৪৬৪।

১২. *প্রাগুক্ত*।

১৩. *প্রাগুক্ত*, ৪৬৬।

১৪. কৌশিকোত্তম প্রামানিক, "মন্তন্তরের প্রেক্ষাপটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : লেখকের শিল্পকুশলতা", *Pratidhawni the Echo,* Vol.IV, Issue-III (January, 2016), 2| www.thecho.in

১৫. আশা দেবী (সম্পা.), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৬৯), ৪২২।

১৬. *প্রাগুক্ত*, ৪৪৪-৪৪৫।

১৭. *প্রাগুক্ত*, প্রথম খণ্ড, ৫৭৩।

১৮. কৌশিকোত্তম প্রামানিক, *প্রাগুক্ত*, ৫।

১৯. আশা দেবী (সম্পা.), *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, ৪৩৩।

২০. এই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রকৃতপক্ষে ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। মফস্বলের এক স্কুলে তিনি মাসিক ৬০ টাকা বেতনের চাকরি করতেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা এম.এ. পাশ। কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় তার সংসারে দেখা দেয় আর্থিক অনটন। মন্বন্তরের সময় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের রিলিফের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের প্রয়োজন দেখা দেয়। আর্থিক স্বচ্ছলতার আশায় শিক্ষকতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে যোগদান করেন।

২১. আশা দেবী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪৩৭।

২২. দেলওয়ার মফিজ, "পঞ্চাশের মন্বন্তর ও মঈনুদ্দীনের আর্তনাত কাব্য", *দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ*, ডিসেম্বর ২১, ২০১৫।

২৩. *প্রাগুক্ত*।

২৪. *প্রাগুক্ত*।

২৫. আলাউদ্দিন আল আজাদ (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, প্রথম খণ্ড (১৯৯৭), ২৪৫।

২৬. *প্রাগুক্ত*, ২৪৫-২৪৬।

২৭. *প্রাগুক্ত*, ২৫৯।

২৮. *প্রাগুক্ত*, ২৬০।

২৯. কবি ফররুখ আহমদের কবিতার পাণ্ডুলিপি থেকে ৪৯টি কবিতা নিয়ে ১৯৭৬ সালে কবি সমালোচক অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় *হে বন্য স্বপ্নেরা* গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ১৬টি কবিতা শ্রেষ্ঠ কবিতার তালিকায় স্থান পায়। কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৩৬-১৯৫০ সালের মধ্যে। এ সময় কবি কলিকাতায় থাকতেন। তাই তার বেশিরভাগ কবিতায় মহানগরী কলকাতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তেতাল্লিশের মন্বন্তর স্থান পেয়েছে। কবির *সাত সাগরের মাঝি* কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা ১৯টি। কবি *সাত সগারের মাঝি* কাব্যগ্রন্থের 'লাশ' কবিতায় দুর্ভিক্ষের নির্মম বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছেন। আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ডে *সাত সাগরের মাঝি* ও দ্বিতীয় খণ্ডে *হে বন্য স্বপ্নেরা* কাব্যগ্রন্থ দু'টি বাংলা একাডেমি কর্তৃক যথাক্রমে ১৯৯৭ এবং ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৩০. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (সম্পা.), *হে বন্য স্বপ্নেরা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৬), ২২।

৩১. আব্দুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৫), ৩২।

৩২. *প্রাগুক্ত*, ৩৪।

৩৩. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৮।

৩৪. *প্রাগুক্ত*, ২১, ২৩ ও ২৭।

৩৫. শফিউল আলম (সম্পা.), *সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনাসমগ্র* (ঢাকা : সিকদার বুক হাউস, ১৯৭৯), ৮১।

৩৬. এম রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৩৩-৩৪।

৩৭. শফিউল আলম (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ৮৮-৮৯।

৩৮. *প্রাগুক্ত*, ৯৯।

৩৯. *প্রাগুক্ত*, ১৯৬-১৯৭।

৪০. *প্রাগুক্ত*, ২১৯।

৪১. *প্রাগুক্ত*, ২২৬।

৪২. *প্রাগুক্ত*।

৪৩. এম রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, ১৩।

৪৪. শ্রী গজেন্দ্র কুমার মিত্র (সম্পা.), *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, পঞ্চম খণ্ড (কলিকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৯১), ১০৭।

৪৫. *প্রাগুক্ত*, ১৭৭।

৪৬. *প্রাগুক্ত*, ২৭৮।

৪৭. হামিদা খানম, *ঝরা বকুলের গন্ধ* (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১), ৭০।

৪৮. *প্রাগুক্ত*, ৭১।

৪৯. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* (ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২), ১৮।

৫০. *দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ*, *প্রাগুক্ত*।

৫১. আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ্, "১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ : রংপুর জেলার একটি সমীক্ষা" (পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮), ৩১।

৫২. *প্রবাসী*, আষাঢ়, ১৩৫১, ৩য় সংখ্যা, ৪৪'শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ১৭০।

৫৩. মোঃ ছাবেদ আলী, "আন্দোলন সংগ্রামে পাবনা জেলা, ১৮২৮-১৯৪৭ : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা" (পিএইচডি থিসিস, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২), ১৬১।

৫৪. *দৈনিক চাঁদপুর কণ্ঠ*, *প্রাগুক্ত*।

৫৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সোনার তরী* (ঢাকা : জয় প্রকাশন, ২০১৯), ৩৩।